পঞ্চম অধ্যায়

গবেষণার রুদ্ধ দুয়ার খুললেন যারা

যৌনতা মানব- সমাজের অত্যন্ত গোপনীয় দিক। মানুষের 'প্রাইভেট- লাইফ'- এর সাথে এর নিবিড় সম্পর্ক। ফলে প্রকাশ্যে যৌনতা নিয়ে আমরা আলোচনা করি না। নানাভাবে ব্যাপারটা এড়িয়ে চলি। কখনো বোধ করি অস্বস্তি। সে সজন্য যৌনতা নিয়ে ভাল কোন গবেষণা আঠারো শতকের আগে শুরুই হয়নি, যদিও রগরগে 'সেক্স ম্যানুয়াল'- এর অভাব সমাজে কখনোই ছিল না। বাৎস্যায়নের কামসূত্রের কথা তো আমরা সবাই জানি। এটি লেখা হয়েছিল বোধ হয় সেই দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দে। তারও আগে ছিল রোমান কবি অভিডের (Ovid) লেখা 'আরস আমাতোরিয়া' বা 'Arts of Love'। এছাড়া ১১৭২ খ্রীষ্টাব্দে লেখা ভারতীয় লাভ ম্যানুয়াল 'অনঙ্গ রাঙ্গা' কিঙ্গা গ্রীক 'এলিফান্তিস'- এর কথাও হয়ত অনেকে জানেন। এগুলোতে নানাপদের আশন- কুশন আর 'ক্যামনে স্ত্রীকে বশে রাখা যায়' – এ নিয়ে রগরগে উপাদান আছে ঢের, কিন্তু এগুলোর কোনটিতেই যৌনতা বিষয়টিকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার দৃষ্টিকোন থেকে দেখা হয়নি।

যৌনতার উপর প্রাথমিক গবেষণা বলতে আমরা অনেকে ফ্রয়েডের গবেষণাই বুঝে থাকি, যদিও ফ্রয়েডেরও আগে রিচার্ড ফ্রেইহার ভন ক্রাফট ইবিং এ নিয়ে বেশ কিছু কাজ করেছিলেন। রিচার্ড ফ্রেইহার মানবজীবনে যৌনতার বিভিন্নরূপকে লিপিবদ্ধ করে ১৮৮৬ সালে 'সাইকোপ্যাথিয়া সেক্সুয়ালিস' (Psychopathia Sexualis) নামে ল্যাটিন ভাষায় একটি যুগান্তকারী বই লিখেছিলেন । বইটিতে তিনি সমকামী প্রবণতাকে এক ধরনের 'মানসিক রোগ' বলে আখ্যায়িত করেন। সমকামিতা ছিলো তার চোখে উত্তরাধিকারের অধঃপতন[1]। তিনি আরো মনে করতেন হস্তমৈথুনের কারণে মানব জীবনে সমকামিতার প্রভাব বৃদ্ধি পায়। বইটি সে সময় শুধু চিকিৎসক কিংবা সার্জনদেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি,

[1] অধঃপতন তত্ত্বের ("Degeneracy" theory) মূল উদ্ভব ঘটেছিলো আঠারো শতকে, কিন্তু উনিশ শতকে এটি পূর্ণতা পায়। মানুষের যে কোন অস্বাভাবিকতা - তা সে নির্বুদ্ধিতাই হোক, কিংবা মানসিক প্রতিবন্ধীত্ব কিংবা হোক না খুন খারাবির মতো কোন অপরাধ - সবই এই ' অধঃপতন' তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা হত । চিকিৎসাবিজ্ঞানের জগতে এই তত্ত্ব প্রবেশ করে ১৮৫৭ সালে বি. এ মোরেল নামে এক ' বিশেষজ্ঞের' হাত দিয়ে। তিনি কিছু বিশেষ শারীরিক অবস্থা - যেমন ক্ষয়রোগ (যক্ষা) এবং ক্রেটিনিজম (এক ধরনের মানসিক প্রতিবন্ধীত্ব) সহ বিভিন্ন রোগের উৎস হিসেবে এই অধঃপতন তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটান। তখন যেহেতু চিকিৎসাবিজ্ঞানের জ্ঞান এত উন্নত পর্যায়ের ছিলো না, ডাক্তাররা এই অদ্ভুতুরে তত্ত্বটিকে গুরুত্ব দিয়েই গ্রহণ করেছিলো বলা যায়। রিচার্ড ভন ক্রাফট ইবিং মোরেলের এই তত্ত্ব তার যৌনতার তত্ত্ব ব্যাখ্যার কাজে ব্যবহার করেন এবং সমকামিতাকে এক ধরণের ' অধঃপতনের প্রকাশ' হিসেবে ব্যাখ্যা করেন।

সাধারণ মানুষদের মাঝেও এটি বিপুল জনপ্রিয়তা পায়। রিচার্ড ফ্রেইহারের জীবদ্দশাতেই এই বইটির প্রায় ডজন খানেক মুদ্রণ প্রকাশিত হয়, অনুদিত হয় পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায়। এই বইটি লেখার আগে বিশ্বে ইবিং- এর তেমন কোন পরিচিতি ছিল না। কিন্তু এই একটি বইই তাকে নিয়ে আসে একেবারে খ্যাতির উজ্জ্বল আলোয়। অখ্যাত এক জার্মান নিউরোলজিস্ট রাতারাতি পরিণত হন ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রধানে। আর তার বই 'সাইকোপ্যাথিয়া সেক্সুয়ালিস' দেশ বিদেশে মুড়ি মুরকির মতই বিক্রি হতে থাকে। এই বইটিই মুলতঃ প্রথম বারের মত 'বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন' থেকে সমকামিতাকে সর্বসাধারণের কাছে এক ধরনের 'মানসিক রোগ' এবং 'অসুস্থতা' হিসেবে চিহ্নিত করেছিলো, যার প্রভাব বজায় ছিলো পরবর্তী একশ বছর পর্যন্ত[2]। আর তার বইয়ের সূত্রেই বিজ্ঞানীরা খুঁজে পেলেন 'পাগল সারাবার' নানা চিকিৎসা; অন্য দিকে ধর্মের ধ্বজাধারী চার্চ খুঁজে পেল সমকামীদের হেনস্থা করার সুদৃঢ় 'বৈজ্ঞানিক ভিত্তি'। যদিও সেসময়ের জ্ঞানের প্রেক্ষাপটে সমকামিতার কোন জৈববৈজ্ঞানিক ভিত্তি রিচার্ড ইবিং- এর জানা ছিলো না, কিন্তু 'নিঃসংশয়ী এবং প্রত্যয়ী' ইবিং ঢালাওভাবে তার বইয়ে অভিমত ব্যক্ত করেন যে, সমকামীরা বিকৃত মনোভাবাপন্ন, কারো সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে অক্ষম এবং তারা মনোরোগী[3]। বলা বাহুল্য, সমকামী প্রবৃত্তি নিয়ে ইবিং- এর গৎবাঁধা বুলিগুলো আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রে পরিত্যক্ত হয়েছে অনেক আগেই[4]। কিন্তু তিনি প্রথম অপ্রচলিত 'হোমোসেক্সুয়ালিটি' শব্দটিকে (যা কার্ল মারিয়া কার্টবেরি অনেক আগে ১৮৬৯ সালে একটি প্যাম্ফ্লেটে ব্যবহার করেছিলেন) একাডেমিয়ায় শুধু নয়, সর্বসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলেন এবং এ সংক্রান্ত গবেষণার দুয়ার উন্মোচন করেন। ইবিং- এর এ ধরণের গবেষণায় অনুপ্রাণিত হন আরেক বিখ্যাত যৌনগবেষক – যার নাম আমরা সবাই জানি - বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড এস. ফ্রয়েড।

বিশ শতকের প্রথম দিকে সিগমুন্ড ফ্রয়েড তার বিভিন্ন মক্কেলদের সাথে কথোপকথোন এবং তাদের যৌন জীবনের বিভিন্ন ঘটনা অধ্যয়নের ভিত্তিতে যৌনতার যে তত্ত্ব প্রদান করেছিলেন তার প্রভাব পরবর্তী কয়েক দশক ধরে বজায় ছিল। তবে পরবর্তীতে ফ্রয়েডের অনেক গবেষণাই ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়। যেমন, কোন আবদ্ধ পরিবারে বাবার দূরে থাকার কারণে কোন ছেলে কেন সমকামীমনোভাবাপন্ন হয়ে উঠতে পারে তা ব্যাখ্যা করতে দিয়ে ফ্রয়েড বলেন, ছেলেটি 'ইডিপাস কম্পলেক্স' থেকে মুক্ত হতে চাচ্ছে। আবার

[2] Francis Mark Mondimore, A Natural History of Homosexuality, The Johns Hopkins University Press; 1 edition, 1996

[3] Krafft-Ebing, R. [1886] 1999. Psychopathia Sexualis. Reprinted by Bloat Books.

[4] Today, most contemporary psychiatrists no longer consider homosexual practices as pathological (as Krafft-Ebing did in his first studies): partly due to new conceptions, and partly due to Krafft-Ebing's own self-correction. From Wikipedia.
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Richard_Freiherr_von_Krafft-Ebing

একই পরিস্থিতিতে একটি মেয়েশিশু কেন সমকামী হয়ে উঠতে পারে তা ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা হল, এতে থাকে তার প্রতি তার মার অবচেতন ঘৃণা (unconscious hatred of their mothers) কিংবা তার ভাইয়ের লিঙ্গের প্রতি ঈর্ষা (envy of a brother's penis)। ফ্রয়েডের এ ধরণের ব্যাখ্যাকে 'বৈজ্ঞানিক' না বলে এখন 'ফ্রয়েডীয় কুসংস্কার' বলাই শ্রেয়। ড. হুমায়ুন আজাদ তার 'নারী' গ্রন্থে এধরণের ফ্রয়েডীয় কুসংস্কার সম্বন্ধে বলেছেন[5],

> '... ফ্রয়েডের সমস্ত সিদ্ধান্ত এখন গন্য হচ্ছে অবৈজ্ঞানিক বলে; শুধু অবৈজ্ঞানিক নয়, চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীলও : একরাশ পিতৃতান্ত্রিক, গোত্রীয় ও ব্যক্তিগত কুসংস্কার পেশ করেছিলেন মনোবিশ্লেষনরূপে। ফ্রয়েড যখন উদঘাটন ও প্রকাশ করে চলেছিলেন মনের 'অদৃশ্য' সূত্র, শোনাচ্ছিলেন লিবিডো, অহম, অবচেতনা, ইডিপাস- ইলেক্ট্রা গূঢ়ৈষা, শিশ্নাসূয়ার পূরাণ; কামকে করে তুলেছিলেন বিশ শতকের আল্লা ... ফ্রয়েডের মানুষধারনাকেই ভুল মনে হয় আজ; পিতৃতন্ত্রের, গোত্রের ও নিজের দুঃস্বপ্ন মানুষ নামে তিনি উপস্থিত করেছিলেন বিজ্ঞানের মুখোশ পরিয়ে।'

ড. হুমায়ুন আজাদের কথায় আবেগের আতিশয্য থাকলেও অতিশয়োক্তি নেই কোথাও। তবে তারপরও বলতে হয়, ফ্রয়েডর গুরুত্ব এখানেই যে তিনিই প্রথম যৌনতা নিয়ে প্রথাগত গবেষণার দ্বার উন্মোচন করেছিলেন। আরো একটা ব্যাপার সেই সাথে গুরুত্বপূর্ণ। ফ্রয়েড তার পূর্বসুরী গবেষক ইবিং এর মত সমকামিতাকে কোন 'রোগ' বলে মনে করতেন না। তিনি ভেনিসের Die Zeit পত্রিকায় সমকামিতা সম্বন্ধে নিজের অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন সরাসরি – 'সমকামী ব্যক্তিরা অসুস্থ নয়'[6]। একবার এক আমেরিকান মহিলা তার ছেলের সমকামিতা সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হয়ে ফ্রয়েডের সাহায্য কামনা করলে, ফ্রয়েড তাকে চিঠিতে জানান-

> 'আমি আপনার চিঠি থেকে যা বুঝলাম তা হল আপনার সন্তান সমকামী। কিন্তু আপনি সেই কথা আপনার চিঠিতে সরাসরি কোথাও উল্লেখ করেননি। আমি কি জানতে পারি কেন আপনি এটা এড়িয়ে গেলেন? সমকামিতার হয়তো কোন উপকারিতা নেই, কিন্তু এতে লজ্জিত হবারও কিছু নেই। এটি কোন অসুস্থতা নয়, কিংবা নয় কোন ধরণের অধঃপতন। এটাকে কোন রোগ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না, বরং আমরা একে যৌনতার এক প্রকারণ (variation) হিসেবে দেখি, যা কোন ব্যক্তি সত্ত্বার মধ্যে বিভিন্ন

[5] হুমায়ুন আজাদ, নারী, আগামী প্রকাশনী, তৃতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০০২

[6] His exact comment was – "Homosexual persons are not sick". (Ref. Francis Mark Mondimore, A Natural History of Homosexuality, The Johns Hopkins University Press; 1 edition, 1996)

> কারণে জন্ম নিতে পারে। প্রাচীন এবং আধুনিক যুগের বহু জ্ঞানী গুনী এবং শ্রদ্ধেয় মানুষজন সমকামী ছিলেন (যেমন প্লেটো, মাইকেলএঞ্জেলো, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি প্রমুখ)। সমকামিতাকে অপরাধ হিসবে চিহ্নিত করে এর উপর নিষ্ঠুর হওয়া নিঃসন্দেহে অনৈতিক হবে'।

তবে ফ্রয়েডের এ ধরণের 'প্রথাগত' গবেষনার অনেক আগেই আঠারো শতক থেকেই – কিছু দার্শনিক সমকামিতার ব্যাপারে নিজেদের ব্যক্তিগত অভিমত জানিয়েছিলেন। যেমন দার্শনিক ভলটেয়ারের (১৬৯৪ - ১৭৭৮) কথা বলা যায়। ভলটেয়ার ১৭৬৪ সালে লেখা একটি বইয়ে সমকামিতাকে প্রকৃতিবিরুদ্ধ অনৈতিক প্রবৃত্তি বলে অভিহিত করেছিলেন; কিন্তু আবার এই আচরণের ব্যাপক প্রসার দেখে বিস্মিতও হয়েছিলেন[7]। তিনি মনে করতেন, এই মানসিকতার উপর মানুষের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কিংবা 'গড়ম বেশী পড়লে' সমকামিতার প্রকোপ বৃদ্ধি পায় বলে তিনি ভাবতেন। আরেক ফরাসী দার্শনিক রুশো (১৭১২ - ১৭৭৮) মনে করতেন সমকামিতা মুলতঃ এসেছে আরব দেশগুলো থেকে। তবে যেহেতু সারা পৃথিবীর সকল দেশেই সমকামিতা ছড়িয়ে গেছে, তাই এর অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়াই সঙ্গত।

ইবিং এর 'সাইকোপ্যাথিয়া সেক্সুয়ালিস' প্রকাশিত হবার আগে ১৮৬২ সালে জার্মানীর মনোবিজ্ঞানী কার্ল হেনরিখ উলরিচস 'উরানিসম'[8] নামের একটি ধারণার জন্ম দেন। সমকামিতার ইতিহাসে উলরিচসের নাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ; তিনি ছিলেন সমকামী মানবাধিকারের আদি প্রবক্তাদের অন্যতম এবং একজন বিদ্রোহী লেখক। প্রথম দিকে তিনি Numa Numantius নামের ছদ্মনামে লিখলেও পরবর্তীতে নিজ নামেই আত্মপ্রকাশ করেন, এবং প্রকাশ্যে নিজেকে 'উরানিয়ান' হিসেবে অভিহিত করতেন (তাকে এখন ইতিহাসের প্রথম 'আউট অব ক্লোজেট' বলে মনে করা হয়)। তিনি আইনের যাতাকলে পিষ্ট সমকামী ব্যক্তিদের অধিকার সম্বন্ধে জনগণকে সচেতন করে তুলেন এবং সমকামিতার প্রতি বিদ্বেষমূলক সমস্ত আইনকানুন লোপ করার আহবান জানান। সমকামিতা তার কাছে কোন 'অপরাধ' ছিলো না, বরং তার চোখে একেবারেই 'প্রাকৃতিক' এবং খুবই 'স্বাভাবিক' একটি প্রবৃত্তি। তিনি তার লেখায় সেজন্যই বলেন, "There is no such thing as unnatural love. Where true love is, there nature is also"

---

[7] অজয় মজুমদার ও নিলয় বসু, সমপ্রেম, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৫।

[8] উরানিজম উনবিংশ শতকের একটি মতবাদ। এই মতবাদে মনে করা হত সমকামী পুরুষেরা আসলে পুরুষ দেহে বন্দি নারী আত্মার অতৃপ্ত প্রকাশ। এরা উলরিচসের চোখে ছিলো তৃতীয় লিঙ্গ।

সমকামিতা সম্বন্ধে সরাসরি কিছু না বললেও ফরাসী চিন্তাবিদ দিদেরোর (১৭১৩- ১৭৮৪) দৃষ্টিভংগী পরবর্তীতে সমকামীদের প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভংগি পাল্টাতে সাহায্য করেছিল। তিনি মানুষের যৌন প্রবৃত্তি নিয়ে অহেতুক নীতি কপচানোর ব্যাপারে চার্চের ভূমিকার সমালোচনা করেন। দিদেরোর মতামতকে গ্রহণ করে নিয়ে পরবর্তীতে বিভিন্ন সাহিত্যিক ও দার্শনিক চার্চের অসহিষ্ণু মনোভাবের নিন্দা করেছেন। এর মধ্যে ফরাসী সাহিত্যিক মার্কুইস দে সাদ এবং এমিল জোলার কথা আলাদা করে বলা যায়। এরা সমকামী মনোবৃত্তিকে জন্মগত বলে মত দিয়েছেন, এবং এও বলেছেন, এই মানসিকতাকে পরিত্যাগ করা যায় না।

এখন একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে বলা যায় যে, সমকামিতা নিয়ে শরীরবৃত্তীয় এবং মনস্তাত্বিক গবেষণা শুরু হয়েছে অনেকদিন ধরেই। শুধু সমকামিতা নয়, পাশাপাশি রূপান্তরকামিতা, উভকামিতা এবং অপরাপর যৌনপ্রবৃত্তি নিয়েও সামগ্রিকভাবে গবেষণা হচ্ছে ঢের। এর ফলে যে যৌন- প্রবৃত্তিগুলো একসময় নিকষ অন্ধকারের কালো চাঁদরে ঢাকা ছিল, তা ধীরে ধীরে উঠে আসছে দিনের আলোতে। সমকামিতা বিষয়ে লিখতে গিয়ে যাদের কথা না বললেই নয়, তারা হলেন ব্রিটিশ ডাক্তার হেনরি হ্যাভলক এলিস (১৮৫৯- ১৯৩৯), জন এডিংটন সিমন্ডস (১৮৪০- ১৮৯৩) এবং জার্মান মনোবিজ্ঞানী ম্যাগনাস হার্চফিল্ড (১৮৬৪ - ১৯৩৫)। এরা সকলেই ছিলেন ইবিং এর প্রায় সমসাময়িক কিন্তু ইবিং এর মতামতের সাথে তারা একমত ছিলেন না।

জন এডিংটন সিমন্ডস বিজ্ঞানের কোন গবেষক ছিলেন না, তিনি ছিলেন উনবিংশ শতকের অন্যতম প্রধান ইংরেজ কবি। সাত খন্ডে প্রকাশিত ‘ইতালির রেনেঁসা’ (Renaissance in Italy) বইটি তার প্রতিভার অন্যতম নিদর্শন। তিনি শুধু কবিতাই লেখেননি, শেলী এবং সিডনির মত ইংরেজ কবি, নাট্যকার বেন জনসন এবং মাইকেল এঞ্জেলোর মত শিল্পীদের জীবনীও লিখেছিলেন। এ ছাড়াও তিনি ছিলেন সাহিত্যের এক উঁচু মানের সমালোচক।

কিন্তু যত বিখ্যাত মানুষের জীবনীই তিনি লিখুন না কেন নিজের জীবনী কিন্তু তিনি আমৃত্যু প্রকাশিত হতে দেননি। তার মৃত্যুর দু’বছর পরে ১৮৯৫ সালে তার প্রকাশক এইচ. এফ. ব্রাউন তার স্মৃতিকথার ভিত্তিতে সিমন্ডসের একটি জীবনী প্রকাশ করেন, কিন্তু সিমন্ডসের মূল পান্ডুলিপিটি তিনি কাউকে দেখতে দেননি। ব্রাউন সাহেব ‘যক্ষের ধনের’ মত সিমন্ডসের পান্ডুলিপিটি নিজের কাছে আমৃত্যু আগলে রাখেন, শুধু তাই নয় ১৯২৬ সালে মৃত্যুর সময় তিনি পান্ডুলিপিটি লন্ডন লাইব্রেরীকে দান করে দিয়ে নির্দেশ দিয়ে যান যে মৃত্যুর পঞ্চাশ বছরের মধ্যে যেন পান্ডুলিপিটি খোলা না হয় – সেটিকে যেন নিভৃত একটি জায়গায় আবদ্ধ করে রেখে দেয়া হয়।

লন্ডন লাইব্রেরী তাই করলো; ব্রাউন সাহেবের প্যাকেটটিকে একেবারে সিল গালা করে লাইব্রেরীর সিন্দুকে তুলে রাখল। এর ২৩ বছর পরে ১৯৪৯ সালে সিমন্ডসের কন্যা ডেম ক্যাথেরিন তার পিতার পান্ডুলিপিটি পড়তে চাইলে লন্ডন লাইব্রেরী 'বিশেষ বিবেচনায়' ক্যাথেরিনের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। ক্যাথেরিনের সামনে উন্মোচিত হল সবুজ এক বাক্সে রাখা ৬ বাই ১২ বাই ১৮ ইঞ্চি এক খাতা, যার উপরের পৃষ্ঠায় লেখা ছিল – 'J A Symond's papers'[9]। কিন্তু ডেম ক্যাথেরিন লাইব্রেরী থেকে ফিরে এসে এ বিষয়ে কাউকে কিছু বললেন না, বাবার পান্ডুলিপি নিয়ে কোন ধরণের উচ্চবাচ্য পর্যন্ত করলেন না। ফলে সিমন্ডসের পান্ডুলিপি রহস্য হয়েই রইলো আম- জনতার কাছে।

১৯৫৪ সালে লাইব্রেরীর উপকমিটি একটি মিটিং করে বাছাই করা কিছু বিশেষজ্ঞকে (বোনাফাইড স্কলার) পান্ডুলিপি পড়বার অনুমতি দিলেন, তাও বিশেষ প্রহরায়। কি ছিলো সেই পান্ডুলিপিতে? কেন এই সতর্কতা? কেনই বা এত লুকোচুরি? লুকোচুরির কারণ বোঝা গেল পান্ডুলিপিটার 'ইমোশোনাল ডেভেলপমেন্ট' নামে একটা অধ্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদ পড়েই[10] –

> 'আমি যখন কারো জীবনী লিখি, তখন চেষ্টা করি সততার সাথে আর অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠভাবে চরিত্রটিকে ফুটিয়ে তুলতে। আমি মনে করিনা আমার নিজের জীবনীর ক্ষেত্রেও সেটা কোন ব্যতিক্রম হবে। কিন্তু বিভিন্ন বোধগম্য কারণে আমার জীবনের সবগুলো ব্যাপার আমার পক্ষে আগে ঠিক মত বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়নি। আমি ভবিষ্যত মনোবিজ্ঞানী এবং সাইকোলজির ছাত্র- ছাত্রীদের জন্য এমন একটি উপকরণ রেখে যেতে চাইছিলাম যেটা পড়ে তারা বুঝতে পারে, এমন মানুষও আছে যার কোন অস্বাভাবিকতা কিংবা মনোবৈকল্য ছিলো না, আগা- গোড়া একটি সুস্থ্য, সুন্দর, স্বাস্থ্যকর জীবন উপভোগ করেছে, কিন্তু এমন একটি অনুভূতিময় কামনায় মত্ত ছিল – যা বর্তমান সমাজের চোখে আপত্তিকর। আর সেই অনুভূতির নাম – পুরুষে পুরুষে প্রেম – সমকামিতা!'

জন এডিংটন সিমন্ডস বড় হয়েছিলেন ইংল্যান্ডের এক মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান হিসবে। আর দশটা ছাত্রের মতই স্কুলে গিয়েছিলেন, বন্ধু বান্ধবেরও অভাব ছিলো না। কিন্তু তিনি ছোটবেলায় খেলাধূলা তেমন পছন্দ করতেন না, তার চেয়ে ঢের বেশি পছন্দ করতেন বই পড়তে। পরে অক্সফোর্ডে এসে গ্রীক সাহিত্যের সাথে পরিচয় ঘটে তার। গ্রীক সাহিত্য

[9] John Addington Symonds, The Memoirs of John Addington Symonds, Univ of Chicago Pr, 1986
[10] পূর্বোক্ত।

এবং ইতিহাস পড়েই সিমন্ডস বুঝতে পারেন সমকামিতা পৃথিবীর ইতিহাসে সবসময়ই ছিলো, কখনো প্রকাশ্যে, কখনোবা অপ্রকাশ্যে। বিশেষতঃ হোমারের *ইলিয়াড* পড়ে তিনি অভিভূত হন। গ্রীক দেবতা হার্মেসের কাহিনীও তাকে উদ্দীপ্ত করেছিল দারুনভাবে, উপন্যাসে বর্ণিত হার্মেসের সৌন্দর্য তার গভীরে তৈরি করল 'ফোয়ারার এক অবিনাশী ফল্গুধারা'[11] । সব মিলিয়ে গ্রীক সাহিত্য সিমন্ডসের সামনে খুলে দিলো প্রবৃত্তির এক অজানা দুয়ার।

এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটিকালীন একটা সময়ে নিজের বাড়িতে যান অবসর কাটাতে। সেখানে তিনি তার চেয়ে বছর তিনেকের ছোট এক ছেলের সাথে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু অচিরেই বুঝলেন এই সম্পর্ককে তিনি স্থায়ী করতে পারবেন না। তিনি যতই গ্রীক সাহিত্য পড়ুন না কেন, তিনি জানেন গ্রীক সমাজের সাথে ভিক্টোরীয় ইংল্যান্ডের বিস্তর ফারাক। ভিক্টোরীয় ইংল্যান্ডে সমকামিতা শুধু অস্বীকৃত নয়, দন্ডনীয় অপরাধ। তিনি লিখলেন -

> I could not marry him; modern society provided no bond of comradeship whereby we might have been united. So my first love flowed to waste…

১৮৬১ সালে সিমন্ডস আরেকটি সমকামিতার সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন, আলফ্রেড ব্রুক নামের একুশ বছরের এক যুবকের সাথে - কিন্তু সে সম্পর্কও স্থায়ী হয়নি। এ সময় বিভিন্ন মানসিক দ্বন্দ্বে তার শরীর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়তে থাকে। যৌন হতাশায় ভুগতে থাকেন সিমন্ডস। এর মধ্যে তিনি বেশ কয়েকজন ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হন। এদের মধ্যে একজন ' রক্ষিতা' রাখারও পরামর্শ দেন, কিন্তু সিমন্ডসের তা মনঃপূত হয়নি।

১৮৮৪ সালে বাবার চাপে পড়ে জ্যানেট ক্যাথেরিন নামের এক মহিলাকে বিয়ে করেন সিমন্ডস। ভাবলেন এর ফলে তিনি ' অস্বাভাবিকতা' থেকে মুক্তি পাবেন। বছর কয়েকের মধ্যেই তিনি চার সন্তানের পিতা হন। কিন্তু ধীরে ধীরে তার উপলব্ধি হতে শুরু করল যে, বিয়ে করাটা ছিলো তার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল। তিনি তার জীবনীতে লিখলেন - ' Perhaps the great crime of my life was my marriage.' ।

ধীরে ধীরে আবারো একাকী হয়ে উঠলেন সিমন্ডস। রোগ শোক প্রায়শঃই হানা দিতে থাকে আগের মতই। তার ডাক্তার পিতা সিমন্ডসের রোগ সনাক্ত করে বললেন তার টিবি হয়েছে। বায়ু পরিবর্তন করে স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য বেশীরভাগ সময়ই তিনি ইতালী এবং

[11] জন এডিংটন তার জীবনীতে এ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন - 'Hermes, in his prime and bloom beauty, unlocked some deeper fountains … in my soul' (source: The Memoirs of John Addington Symonds, পূর্বোক্ত)

সুইজারল্যান্ডে কাটাতে থাকেন। তিনি নিজেকে নিয়ে দুটো স্বতন্ত্র জগৎ তৈরী করে ফেললেন - একটা নিজের স্ত্রী- কন্যাদের জন্য, আর অন্যটি তার বন্ধু জগৎ নিয়ে। তার ফুসফুসের অবস্থার আরো অবনতি ঘটলে তিনি স্ত্রীকে বলেন যে, তাদের একসাথে আর থাকা উচিৎ নয় - এত রোগ- শোক নিয়ে ঘর সংসার করে বউকে বিপদে ফেলা খুবই অনৈতিক। বলাবাহুল্য সমকামিতার ইতিহাসে সিমন্ডসই প্রথম কিংবা সর্বশেষ ব্যক্তি নন - যাকে ' সংসার' নামক এই দ্বিচারিতার সাথে প্রতিনিয়ত যুঝতে হয়েছে। এখনো সমাজের চাপে বহু সমকামীদেরই ' সংসার ধর্ম' পালন করতে হয়, অভিনয় চলতে হয় সমাজের আর দশটি ' স্বাভাবিক' মানুষের মতই। সমকামীদের জীবনের এ এক নিষ্ঠুর বিড়ম্বনা।

এ সময় সিমন্ডস আবারো গ্রীক সাহিত্য এবং সংস্কৃতি নিয়ে পড়াশুনা শুরু করেন। তিনি প্লেটো, অ্যারিস্টোফেন, জেনোফন এবং অন্যান্যদের নিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে যেতে থাকেন। এ সময়েই তিনি নীরবে, নিভৃতে রচনা করেন অষ্ট আশি পৃষ্ঠার একটা পুস্তিকা - ' A Problem in Greek Ethics' । ১৮৮৩ সালে ব্যক্তিগত উদ্যোগে পুস্তিকাটির মাত্র দশ কপি ছাপিয়েছিলেন আর বিতরণ করেছিলেন তার খুব কাছের বন্ধুমহলে। এ বইয়ে তিনি গ্রীক সংস্কৃতির পাইদারেস্তিয়া বা কিশোর প্রেম, ইরোমেনোস - ইরাস্তেস সহ বহু হারিয়ে যাওয়া বিষয় আশয় অন্ধকার থেকে দিনের আলোয় তুলে আনেন। তিনি তার বইয়ে স্পষ্ট করে লেখেন -

> বহু মেডিকেল ডাক্তার এবং আইনী লেখকেরা মোটেও অবগত নন যে, ইতিহাসের পাতায় বহু মহান এবং উন্নত জাতির অস্তিত্ব আছে যারা সমকামিতার প্রতি বিদ্বেষ পোষন করতো না, বরং ছিলো পুরোপুরি সহানুভূতিশীল। এমনকি, তারা সমকামিতার চর্চা করে আত্মিক এবং সামাজিকভাবে লাভবান হয়েছিলো।

বছর খানেক পরে তিনি আরেকটি বই লেখেন - The problem in Modern Ethics (১৮৯১)। তিনি এ বইয়ে সমকামিতার তৎকালীন ধ্যান ধারণা এবং বৈজ্ঞানিক এবং সমাজ- মনস্তাত্বিক কারণ লিপিবদ্ধ করেন। এই বইয়ে তিনি প্রস্তাব করেন যে, সমকামিতা সম্পর্কে নিবর্তনমূলক ধ্যান ধারণা আর আইন কানুন রহিত করা প্রয়োজন। এই বইটি পঞ্চাশ কপি ছাপিয়েছিলেন সিমন্ডস এবং খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের মাঝে বিতরণ করেন। তাদের বলে দেয়া হয় যে, তারা বইটি পড়ার সময় বইয়ের পাশে নোট লিখে যেন লেখককে আবার ফেরৎ দেন। ঠিক এ সময়ই বিখ্যাত ইংরেজ কবি অস্কার ওয়াইল্ডকে সমকামিতার অপরাধে দুই বছরের দন্ড পোহাতে হয়। সম্ভবতঃ সিমন্ডস এ কারণেও যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন।

সমকামিতার ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ‘এ প্রবলেম অব গ্রীক এথিক্স’ এবং ‘প্রবলেম অব মডার্ণ এথিক্স’ – বই দুটোর গুরুত্ব অপরিসীম। এ দুটো বইকে বর্তমানে ইংরেজী সাহিত্যের জগতে প্রথম দিককার পুস্তক হিসেবে বিবেচনা করা হয় যেখানে পুরুষে পুরুষে প্রেমের সরাসরি তথ্যসূত্র বিশ্বস্তভাবে সন্নিবেশিত হয়েছিলো। তা সত্ত্বেও সিমন্ডসের মনে হয়েছিলো সমকামিতা সম্বন্ধে মানুষজনকে বৈজ্ঞানিকভাবে সচেতন করতে হলে চিকিৎসাশাস্ত্রের দৃষ্টিকোন থেকে ব্যাপারগুলোকে ব্যাখ্যা করতে হবে। কিন্তু সিমন্ডস নিজে চিকিৎসাশাস্ত্রের কোন বিশেষজ্ঞ না হওয়ায় এদিক থেকে সন্তুষ্টি পাচ্ছিলেন না। ঠিক এসময়ই ১৮৯০ সালে তার সাথে পরিচয় ঘটে ব্রিটিশ ডাক্তার হ্যাভলক এলিসের সাথে। এ যেন ছিলো সঠিক সময়ে সত্যিকার মনি- কাঞ্চন যোগ।

এ প্রসঙ্গে পাঠকদের জন্য হ্যাভলক এলিস সম্বন্ধেও কিছু বলে নিতে হয়। সে সময় এলিস ছিলেন সিমন্ডসের চেয়ে প্রায় বছর বিশেক ছোট। নিজে সমকামী না হলেও হ্যাভলক এলিসের স্ত্রী ছিলেন সমকামী[12]। ফলে তিনি খুব কাছ থেকে সমকামীদের জীবন প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পান। তিনি বিশ্বাস করতেন, সমকামিতার আইনী স্বীকৃতির আগে এই প্রবৃত্তিসম্পন্ন মানুষদের সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা পাওয়া দরকার । ১৮৯৭ সালে তিনি প্রকাশ করেন ‘Sexual Inversion’ নামের একটি অনন্যসাধারণ গ্রন্থ। গ্রন্থটি এলিসের বলা হলেও আসলে গ্রন্থটি লিখেছিলেন এলিস এবং সিমন্ডস দু’জনে মিলে। হ্যাভলক এলিস লিখেছিলেন বইটির মূল অংশ – চিকিৎসাস্ত্র এবং জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিকোন থেকে, আর ঐতিহাসিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক তথ্য সরবরাহ করেছিলেন জন এডিংটন সিমন্ডস। এ ছাড়াও সিমন্ডস ‘উলরিচসের দৃষ্টিভঙ্গী’ নামে একটি অধ্যায় বইটিতে নিজের নামেই সংযুক্ত করেন এবং তার পুর্বেকার লেখা ‘প্রবলেম ইন গ্রীক এথিক্স’ সন্নিবেশিত করেন বইয়ের পরিশিষ্টে। বইটির প্রথম মূদ্রণ দু’জনের নামেই প্রকাশিত হয়েছিলো ১৮৯৭ সালে। কিন্তু বইটি প্রকাশের পর সিমন্ডেসের পরিবারের পক্ষ থেকে আপত্তি জানানো হল – প্রকাশকের কাছে দাবী করা হল যেন, বইটি থেকে সিমন্ডসের নাম এবং সমস্ত রেফারেন্স তুলে নেয়া হয়। সিমন্ডসের বইয়ের সম্পাদক হোরাশিও ব্রাউন সব জায়গা খুঁজে খুঁজে বইটির কপি সংগ্রহ করে বাজার থেকে তুলে নেয়ার প্রচেষ্টা চালান, যদিও কিছু কপি তার হাতের ফাঁক গলে ঠিকই পাঠকদের হাতে পৌঁছিয়ে গিয়েছিলো। এই চাপ সামলাতে গিয়ে এলিসকে মহা বিপদে পড়তে হয়। অবশেষে, বইটির দ্বিতীয় মূদ্রণ প্রকাশের সময় এলিস সিমন্ডসের নাম তুলে নেন,

[12] যে কোন বিচারে হ্যাভলক এলিস এবং তার স্ত্রী এডিথ লীজের বিয়ে ছিল সে সময়ের প্রেক্ষাপটে খুবই ব্যতিক্রমী। এলিসের স্ত্রী এডিথ লীজ ছিলেন নারীবাদী কবি (তার অন্য চার বোনেরা ছিলেন আবার সবাই অবিবাহিত)। তারা পারস্পরিকভাবে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেও দু’জনেই সাড়া জীবন মুক্ত সম্পর্কে (Open relationship) আস্থাশীল ছিলেন, এবং একে অন্যের যৌনস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতেন না । যৌনতার ব্যাপারে তারা ছিলেন সমস্ত সামাজিক সংস্কারের উর্ধ্বে।

‘প্রবলেম ইন গ্রীক এথিক্স’ অংশটি পরিশিষ্ট থেকে বাদ দেন ‘উলরিচসের দৃষ্টিভঙ্গী’ অধ্যায়টির লেখক হিসেবে অজ্ঞাত ‘Z’ অন্তর্ভুক্ত করেন; এবং সিমন্ডসের দেওয়া তথ্যসূত্রকে ‘বিশ্বস্ত সূত্রে’ পাওয়া বলে উল্লেখ করেন[13]। বইটির এই পরিবর্তিত মূদ্রণটি চিকিৎসকদের মধ্যে যথেষ্টই গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল, যেটা ছিলো আসলে তাদের বইটি লেখার পেছনে মূল অনুপ্রেরণা।

এই বইয়েই প্রথম বারের মত ইবিং- এর সমকামিতাকে ‘বিকৃতি’ বা ‘ব্যাধি’ হিসবে প্রচার করার প্রচেষ্টার বিরোধিতা করা হয় – বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোন থেকে। এলিস বইটিতে ইবিং এর ‘অধঃপতন’ তত্ত্বের বিপক্ষে শক্তিশালী যুক্তি হাজির করেন, তিনি বইটিতে ইবিং- এর হস্তমৈথুনের সাথে সমকামিতার সম্পর্কের ধারণাও বাতিল করে দেন। আর তারপর ১৯১৫ সালে এলিস প্রকাশ করেন আরেকটি গ্রন্থ ‘Psychology of Sex’। এলিস যে সময় এ ধরণের গবেষণা শুরু করেছিলেন সে সময়টায় ইংল্যান্ড ছিল পুরোমাত্রায় রক্ষণশীল। ফলে গবেষণা করতে গিয়ে এলিসকে দূর্বিসহ অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছিল। তার প্রথম বই প্রকাশের পর বইয়ের সবগুলো কপি পুড়িয়ে ফেলা হয়। প্রকাশককে পেতে হয় কঠিন শাস্তি। পরে তার গবেষণাকাজের অধিকাংশই আমেরিকা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল[14]।

সমকামিতার গবেষনায় আরেকজন গবেষক - যার গুরুত্ব অপরিসীম তিনি হলেন জার্মানীর মনোবিজ্ঞানী ম্যাগনাস হার্চফিল্ড। তিনি সমকামীদের ‘তৃতীয় লিঙ্গ’ নামে অভিহিত করে সমাজে বিদ্যমান লিঙ্গ সংক্রান্ত সনাতন ধারনা খন্ডন করতে প্রয়াসী হন। শুধু গবেষনাই নয়, তিনি সে সময় ‘সায়েন্টিফিক এন্ড হিউম্যানিটেরিয়ান কমিটি’ নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। হার্চফিল্ড ছিলেন যুক্তিনিষ্ঠ একজন মানুষ। তিনি যুক্তিনির্ভর কথা বলতেন এবং সব ধরনের বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা এবং বক্তব্যকে স্বাগত জানাতেন। সমকামিতার নানান দিক বিশ্লেষণ করার জন্য তিনি দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, মনোবিজ্ঞানী, নৃতাত্ত্বিক এবং আইনজ্ঞদের তাঁর সংস্থায় স্থান করে দিয়েছিলেন। তার কমিটির শ্লোগান ছিল – ‘জাস্টিস থ্রু সায়েন্স’।

---

[13] Francis Mark Mondimore, A Natural History of Homosexuality, পূর্বোক্ত।

[14] কথিত আছে, এক পুলিশের গোয়েন্দা ১৮৯৮ সালের ২৭ শে মে লন্ডনের একটি বইয়ের দোকান থেকে দশ শিলিং দিয়ে ‘সেক্সুয়াল ইনভারশন’ নামে একটি বই ক্রয় করেন। এর চারদিন পরে পুলিশ দোকানে এসে জর্জ বেডব্রাউ নামে দোকানের এক কর্মচারীকে গ্রেফতার করেন দোকানে ‘অশ্লীল’ বইপত্র রাখার অযুহাতে। এলিসকে গ্রেফতার করা না হলেও এলিস এবং প্রকাশকের উপর দিয়ে রীতিমত ঝড় বয়ে যায় সে সময়। পত্র- পত্রিকাতেও নানা রকমের রং- বেরঙের কেচ্ছা কাহিনী লেখা হতে থাকে। বেডব্রাউকে অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত করা হয় এবং শাস্তি দেয়া হয়। এলিস সব কিছু দেখে এতই ক্ষুব্ধ হন যে তিনি তার পরবর্তী বই আর ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশ করবেন না বলে মনস্থ করেন।

বস্তুতঃ এই সংস্থার উদ্যোগে জার্মানীতে প্রথমবারের মত বৈজ্ঞানিকভাবে সমকামী মানসিকতার কারণ নির্ণয় করা শুরু হয়। শুধু তাই নয়, সমকামিতার আইনী স্বীকৃতির ব্যাপারে এই সংস্থা সচেষ্ট হয়। তখনকার জার্মান ফৌজদারী দন্ডবিধির ১৭৫ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সমকামিতা বিষয়ক আইন সংশোধনের জন্য হার্চফিল্ড পাঁচ হাজার বুদ্ধিজীবীর স্বাক্ষর সম্বলিত দরখাস্ত সরকারের কাছে পেশ করেন। ১৯১৩ সাল থেকে সহযোগী গবেষক ইভান ব্লোচের সাথে মিলে সমকামী মানুষদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন এবং যৌনতা সম্বন্ধে দৃষ্টিভংগী পাল্টানো্র জন্য আন্দোলন গড়ে তুলেন, এবং এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য 'Institut für Sexualwissenschaft' নামে আরেকটি সংগঠনও গড়ে তুলেন। ১৯৩৩ সালে নাৎসীরা ক্ষমতায় এসে হার্চফিল্ডের কাজ বন্ধ করে দেয় এবং এই প্রতিষ্ঠানটি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। হার্চফিল্ড এবং সমমনা সমস্ত লেখকদের বই পত্র পুড়িয়ে দেওয়া হয়। আজকে ইন্টারনেটে নাৎসী বাহিনীর বই- পোড়ানোর যে সমস্ত ছবি পাওয়া যায়, তার অধিকাংশই আসলে হার্চফিল্ডের বিভিন্ন লাইব্রেরীর[15] ।

চিত্রঃ নাৎসী বাহিনী ১৯৩৩ সালে ক্ষমতা দখলের পর হার্চফিল্ড এবং সমমনা সমস্ত লেখকদের বই পত্র পুড়িয়ে দেয়।

এত কিছু করেও কিন্তু এ সংক্রান্ত গবেষণা থামিয়ে রাখা যায় নি। ফার্ডিন্যান্ড হ্যাক, এডিংটন সায়মন্ডস, ইভান ব্লোচ, ক্লারা থমসন, থিডর হেনরিখ, ইরভিং বেইবার, অটো

[15] 'The press-library pictures & archival newsreel film of Nazi book-burnings seen today are usually pictures of Hirschfeld's library ablaze', wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Magnus_Hirschfeld

গ্রস, হুকার, মিলার, স্কোফিল্ড, হেনরি বেঞ্জামিন প্রমুখ গবেষকের বহুমুখী গবেষণা গহীন আঁধার থেকে সমকামিতাকে নিয়ে আসল দিনের আলোয়। এদের মত গবেষকদের জন্যই সহমর্মিতা আর সহিষ্ণুতার ঢেউ এসে লাগে সমাজে। একদিন যাদের অচ্ছুৎ বলে গন্য করা হত, দেখা হত সমাজের 'নিকৃষ্টতম জীব' হিসেবে, তাদের প্রতি বাড়িয়ে দেওয়া হল সাহায্যের হাত। সারা পৃথিবী জুড়ে বহুসংগঠন গড়ে উঠল এই সংখ্যালঘু এবং প্রান্তিক মানুষদের সাহায্য করার এবং তাদের মানবিক অধিকার রক্ষার তাগিদে। রক্ষণশীলতা, প্রগতিশীলতা, বিজ্ঞান ও বাস্তবতার প্রতিনিয়ত সংঘর্ষ আর প্রতিসংঘর্ষে একটা সময় যৌনতা সংক্রান্ত সনাতন ধারনাই গেল পালটে। পৃথিবীতে শিল্প বিপ্লব, প্রযুক্তির বিপ্লব, এনলাইটমেন্টের পাশাপাশি হাত ধরে বিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করল 'যৌনতার বিপ্লব' – যা মানুষের যৌণতাসংক্রান্ত সামাজিক এবং মনঃস্তাত্বিক ধ্যান ধারণাকেই আমূলভাবে পালটে দিল। আর যে ব্যক্তিটির গবেষণা এই যৌনতার বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছিল সবচেয়ে বেশি, তিনি হলেন আমেরিকার ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রানীবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আলফ্রেড কিন্সে (১৮৯৪ - ১৯৫৬)।

কথিত আছে, প্রকৃতিপ্রেমিক এই তরুণ প্রফেসর কিন্সে গল ওয়াস্প নামে একধরনের বোলতার উপর ক্লাসে একদিন লেকচার দিচ্ছিলেন। সেখান থেকে আলোচনা কোন একভাবে চলে গেল বোলতাদের যৌনপ্রবৃত্তির দিকে। ক্লাসের অনেক ছাত্র সুযোগ পেয়ে এ সময় নানাধরনের প্রশ্ন করা শুরু করল। কখনও বা তা চলে গেল চড়াই উৎরাই পেরিয়ে মানুষের যৌনপ্রবৃত্তির দিকেও। কিন্সে তার জীববিজ্ঞানের সীমিত জ্ঞানের আলোকে ছাত্র-ছাত্রীদের কৌতুহল মেটাতে থাকলেন। পুরো ক্লাস পরিণত হল এক 'সরস' আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। এমনকি এর জের পুরোমাত্রায় বজায় রইল ক্লাসের বাইরেও। অনেক ছাত্র- ছাত্রী কিন্সের কক্ষে এসে ব্যক্তিগতভাবে যৌনতা বিষয়ে নানা ধরণের পরামর্শ চাওয়া শুরু করল। কিন্সে দেখলেন, এই বিষয়টি নিয়ে ছাত্র- ছাত্রীদের আগ্রহ রয়েছে প্রচুর, কিন্তু পুরো বিষয়টিকে ঢেকে রাখা হয়েছে নীতি- নৈতিকতার অদৃশ্য কালো চাঁদরে। তিনি বুঝতে পারলেন, 'সেক্স নিয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা না করার' এই চিরায়ত সনাতনী প্রথাটা যে করেই হোক ভাংতে হবে। তিনি ছাত্রদের ডীনের কাছে ধর্না দিলেন, এবং ছাত্র- ছাত্রীদের মধ্যে যৌনশিক্ষার একটি কোর্স চালু করার পক্ষে ওকালতি শুরু করলেন। বললেন, ছাত্র- ছাত্রীরা যে হারে আমাদের দেশের মত 'রসময়গুপ্ত মার্কা' চটি বই পড়ে সেক্স সম্বন্ধে ভুল ভাল ধারণা পাচ্ছে, তার থেকে আমরা একাডেমিকভাবে কিছু পড়াই না কেন! কিন্সে শেষ পর্যন্ত তার আবেদন মঞ্জুর করিয়ে ছাড়লেন। তিনি ফুল হাউজ অডিটোরিয়ামে একাডেমিকভাবে প্রথম 'সেক্স কোর্স' –এর উপর ক্লাশ নিতে শুরু করলেন। তবে সে ক্লাস উন্মুক্ত ছিল কেবল শিক্ষকবৃন্দ, গ্র্যাজুয়েট কিংবা সিনয়র ছাত্র, কিংবা বিবাহিত ছাত্র- ছাত্রীদের জন্য। কিন্সে আগের মতই ছাত্র- ছাত্রীদের বিভিন্ন প্রশ্নের

উত্তর দিয়ে কৌতুহল মিটাতে লাগলেন। কিন্তু তা করতে গিয়ে খুব আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, মানুষের যৌনপ্রবৃত্তি এবং যৌনজীবনের উপর বিজ্ঞানভিত্তিক কোন ভাল সমীক্ষাই বাজারে নেই। ফলে একটা সময় কিন্সের নিজেকেই যৌনপ্রবৃত্তি নিয়ে গবেষণায় নামতে হল। সম্পূর্ন ব্যক্তিগত উদ্যোগে সমীক্ষার প্রয়োজনে প্রশ্নাবলী তৈরি করলেন, এবং দীর্ঘ সময় ধরে এ কাজে নিজেকে নিয়োজিত করলেন। সম্পুর্ণ নিরপেক্ষ ও নির্মোহভাবে এ গবেষণা চালিয়ে ১৯৪৮ সালে লিখলেন 'Sexual Behavior in the Human Male' নামে একটি যুগান্তকারী বই; এবং এর পাঁচ বছর পর ১৯৫৩ সালে বের করেন 'Sexual Behavior in the Human Female'। গ্রন্থদুটির মধ্য দিয়ে মানব জীবনের এমন কিছু দিক উন্মোচিত হল যা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জন্য নতুন, এবং অনেকের কাছেই খুব 'অস্বস্তিকর'। এমনকি এসব তথ্য দেখে কিন্সে নিজেও খুব বিস্মিত হয়েছিলেন। সেই পঞ্চাশের দশকের শুরুতেই কিন্সের গবেষণা থেকে বেরিয়ে এল, মানুষকে সামাজিকভাবে কেবল বিষমকামী বলা একেবারেই ঠিক নয়, বহু মানুষ আছে যারা যৌনপ্রবৃত্তিগত দিক দিয়ে সমকামী। শুধু তাই নয়, তিনি বললেন, যৌনপ্রবৃত্তিকে কেবল বিষমকাম আর সমকাম – মোটা দাগে এই দু'ভাগ করাটাও বোকামী। যৌনতার সম্পুর্ণ ক্যানভাসকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিমাপ করার জন্য কিন্সে উদ্ভাবন করলেন তার বিখ্যাত 'কিন্সে স্কেল'। এ স্কেল সমন্ধে কিন্সে তার বইয়ে বলেন[16],

> 'পুরো জনসমষ্টিকে কেবল সমকামী আর বিষমকামী – এ দুই নির্দিষ্ট ভুবনের বাসিন্দা মনে করা ভুল হবে। পৃথিবীটা কেবল – ছাগল আর ভেড়ায় বিভক্ত নয়। প্রকৃতিতে খুব কম ক্ষেত্রেই এ ধরণের চরমসীমার রাজত্ব দেখা যায়, এর চেয়ে বরং এখানে থাকে বিবিধ উপাদানের সুষম বন্টন।'

কিন্সের স্কেলেটি নিয়ে কিছু কথা বলা যাক। স্কেলের দুই প্রান্তকে '০' এবং '৬' হিসেবে চিহ্নিত হয়। ০ দাগে অবস্থিত ব্যক্তিরা পরিপূর্ণভাবে বিষমকামী, আর ৬ দাগে অবস্থিত ব্যক্তিরা সম্পুর্ণভাবে সমকামী। দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী অবস্থা পাঁচটিভাগে বিভক্ত; এবং ওই পাঁচটি অবস্থার মধ্য দিয়ে যৌনতার যে রূপ প্রতিভাত হচ্ছে তাকে উভকামিতা বলাই শ্রেয়, যদিও উভকামিতার রকমফের আছে। নীচের ছকটি দেখলে এ সম্বন্ধে আরেকটু ভাল বোঝা যাবে :

[16] Wardell B. Pomeroy, Clyde E. Martin, Alfred C. Kinsey Paul H. Gebhard , Sexual Behavior in the Human Female, AND Sexual Behavior in the Human Male, W. B. Saunders Company , 1953

রেটিং	বর্ণনা
০	পরিপুর্ণভাবে বিষমকামী
১	মূখ্যত বিষমকামী, কদাচিৎ সমকামী
২	মূখ্যত বিষমকামী, কিন্তু প্রায়শই সমকামী
৩	বিষমকামিতা এবং সমকামিতার প্রভাব সমান
৪	মূখ্যত সমকামী, কিন্তু প্রায়শই বিষমকামী
৫	মূখ্যত সমকামী, কদাচিৎ বিষমকামী
৬	পরিপুর্ণভাবে সমকামী
X	অযৌনপ্রজ (Asexual)

উপরের ছকটি কিন্সের স্কেলের সারমর্ম বলা যেতে পারে, যদিও কিন্সে বইটি লিখার সময় অযৌনপ্রজদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেন নি। এটি স্কেলে অন্তর্ভুক্ত হয় পরে। আগেই বলা হয়েছে '০' দাগাঙ্কিত কক্ষটি থাকে পরিপুর্ণভাবে বিষমকামীদের দখলে। এই কক্ষে থাকা লোকেরা কখনোই সমকামের সাথে যুক্ত হয় না। '১' চিহ্নিত কক্ষে অবস্থানরত ব্যক্তিরা মূলতঃ বিষমকামী হওয়া সত্ত্বেও কালেভদ্রে সমকামিতার সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে। এরা পরিবেশ- পরিস্থিতির কারণে কিংবা কৌতুহলবশতঃ হঠাৎ করে সমকামী সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লেও এর সাথে কোন গভীর মানসিক সম্পর্ক গড়ে উঠে না। '২' চিহ্নিত কক্ষের লোকেরা প্রবৃত্তিগত দিক দিয়ে এদের মতই, কিন্তু এদের সমকামী প্রবণতা আরেকটু বেশি

; কিন্তু তারপরও তা কখনোই বিষমকামীতাকে ছাপিয়ে যায় না। '৩' নম্বর কক্ষের আধিবাসীরা হয়ত সত্যিকার উভকামী। এদের সম্পর্কে কিন্সে বলেন[17], 'তারা সমানভাবে দুই ধরণের সংশ্রবই গ্রহণ এবং উপভোগ করে থাকে। কোনটির উপরেই তাদের কোন নির্দিষ্ট পক্ষপাতিত্ব নেই।' '৪' নং কক্ষের সদস্যরা সমকামী হওয়া সত্ত্বেও প্রায়ই বিষমকামের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে। একইভাবে '৫' নং কক্ষে এমন কিছু মানুষের সন্ধান মিলবে যারা সমকামী হয়েও মাঝে মধ্যে কিংবা কদাচিৎ বিষমকামে জড়িয়ে পড়ে।

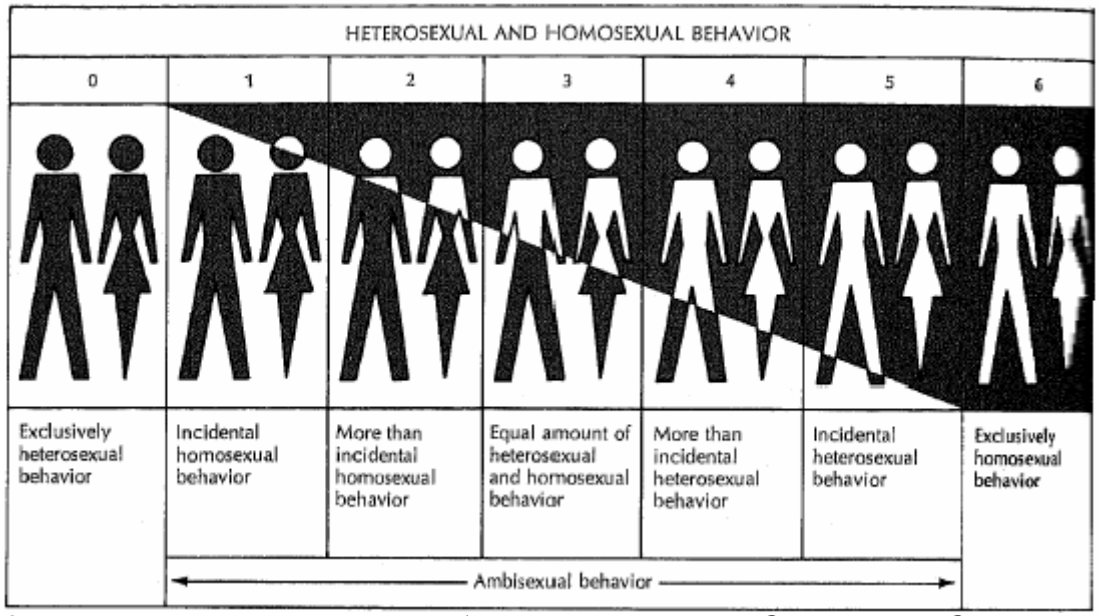

চিত্র : কিন্সে স্কেল থেকে বোঝা যায়, যৌনপ্রবৃত্তিকে কেবল সমকামী আর বিষমকামী – এ দুই ভাগে ভাগ করা ভুল হবে ।

'৬' নং কক্ষের বাসিন্দারা পরিপূর্ণ সমাকামী। ছকটি ভালভাবে দেখলে বোঝা যায় যে, ০ এবং ৬ বিপরীত মেরুতে। তেমনিভাবে ১ এবং ৫ পরস্পরের বিপরীত। ঠিক একইভাবে ২ এর বিপরীতে ৪ এর অবস্থান। অর্থাৎ, ০ এবং ৬ –এই চরমসীমা বাদ দিলে বাকী পাঁচটি কক্ষের অধিবাসীরা কমবেশি উভকামী।

যৌনপ্রবৃত্তি নিয়ে কিন্সের যুগান্তকারী গবেষণা বই আকারে প্রকাশের পর পরই ড. কিন্সে তৎক্ষনাৎ সেলিব্রিটিতে পরিণত হয়ে গেলেন। ১৯৫৩ সালের অগাস্টের ২৪ তারিখে ড. কিন্সেকে নিয়ে টাইম ম্যাগাজিনে প্রচ্ছদ প্রতিবেদন বের হল, এবং তাতে লেখা হল – 'কিন্সে সেক্সের ক্ষেত্রে সেই কাজটিই করলেন যে কাজটি অনেকদিন আগে কোপার্নিকাস করেছিলেন পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে'। এমনকি তাকে নিয়ে একটি কমিক বই পর্যন্ত বাজারে

[17] পূর্বোক্ত।

বের হয়ে গেল – "ওহ! ড. কিন্সে'। মার্থা রে'র লেখা এই কমিক বই- এর বিক্রি সে সময়ই আধা মিলিয়নে ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

চিত্রঃ টাইম ম্যাগাজিনের (আগাস্ট ২৪, ১৯৫৩) প্রচ্ছদে ড. কিন্সে

কিন্সে তাঁর যুগান্তকারী গবেষণার মাধ্যমে নতুন ধারা তৈরি করার পর আরো বহু গবেষক এ ধরনের কাজে এগিয়ে এলেন। এর মধ্যে সান্ড্রা বেম, জ্যানেট স্পেন্সর, রবার্ট হেলম্রিখ প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। সারা পৃথিবী জুড়ে যৌণ মনোবিজ্ঞানীদের নানা পদের গবেষণায় নতুন নতুন তত্ত্বের আগমন ঘটতে লাগল। এর সাথে যোগ দিলেন জীববিজ্ঞানীরাও। মনঃস্তাত্বিক, আচরণগত, সমাজ- সাংস্কৃতিক, এবং যৌন অভিজ্ঞতার পাশাপাশি জেনেটিক, কগনিটিভ, হরমোনাল, শরীরবৃত্তিয়, মস্তিস্ককেন্দ্রিক এবং বিবর্তনীয় নানা রকমের গবেষনা যৌনপ্রবৃত্তির নানা আকর্ষণীয় দিক উন্মোচন করে চলল। প্রতিদিনই নতুন নতুন জ্ঞানের আলোকে আমরা ঝালাই করে নিতে থাকলাম আমাদের পরিপার্শ্বিকতাকে।

১৯৮০ সালে ক্যানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাইকেল স্টর্মস এর একটি গবেষণা পত্রে মত প্রকাশ করলেন[18], যৌন প্রবৃত্তি নির্ধারিত হওয়া উচিৎ কোন ব্যক্তির ফ্যান্টাসি এবং কামপ্রবণতার (eroticism) উপর নির্ভর করে, কারো দৈনন্দিন যৌনকর্মের উপর

[18] Michael D. Storms, Theories of sexual orientation. Journal of Personality and Social Psychology 38: 783-792, 1980.

ভিত্তি করে নয়। তিনি দেখালেন, কোন কোন সময় উভকামীর ফ্যান্টাসির জগৎটা এমনভাবে আচ্ছন্ন থাকে যে, তা কেবলমাত্র পরিপূর্ণ বিষমকামের সাথেই তুলনীয়। আবার বিপরীত ছবিটাও কখনো সখনো প্রকট হয়ে উঠে। অর্থাৎ, উভকামীর মধ্যে দেখা দিতে পারে তীব্র সমকামিতার প্রকাশ।

এরপর ১৯৮৫ সালে ফ্রিৎস ক্লেইন তার সহযোগী সেপেকফ এবং উলফের সাথে মিলে যৌনতা পরিমাপের একটু ভিন্নধর্মী স্কেল উদ্ভাবন করেন; একে 'Klein Sexual Orientation Grid' নামে অভিহিত করা হয়। কিন্সের স্কেলটি ছিল সরল রৈখিক এবং একমাত্রার। ক্লেইন একে দ্বিমাত্রার ছক (মেইট্রিক্স) আকারে প্রকাশ করেন। তিনি যৌনতাকে স্থবির নয়, বরং 'গতিশীল' এবং 'বহু চলক সমৃদ্ধ' জটিল ব্যাপার বলে মনে করেন। তিনি তার ক্লেইন- স্কেল নির্মাণের ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যোগ করেন এবং মত প্রকাশ করেন - যৌনতার ব্যাপারটি পুরোপুরি বুঝতে হলে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সচেতন হওয়া প্রয়োজন; এগুলো হল, যৌনপ্রবৃত্তি, যৌন আচরণ, যৌন আকর্ষণ, যৌনতা সম্বন্ধে ফ্যান্টাসি, আবেগ, যৌন সঙ্গী, জীবন ধারা, আত্মপরিচয় ইত্যাদি। এইভাবে নতুন- নতুন গবেষণায় প্রতিনিয়ত উন্মোচিত হতে থাকে যৌনতা বিষয়ক নানান দিক। তবে তারপরও কিন্সের গুরুত্ব কখনোই ম্লান হয়নি। বরং বলা যেতে পারে, যৌনতা বিষয়ে সমস্ত গবেষণার ভিত্তি হিসেবে কিন্সের গবেষণাকে চিহ্নিত করা হয়। সেজন্য কিন্সের গবেষণার প্রায় ষাট বছর পরে আজও গবেষক রবার্ট এপস্টেইন সায়েন্টিফিক আমেরিকান মাইন্ডের একটি বইয়ে (২০০৬) লেখেন :

> "Ever since the late 1940s, when biologist Alfred Kinsey published his extensive reports on sexual practices in the U.S., it has been clear, as Kinsey put it, that people "do not represent two discrete populations, heterosexual and homosexual....The living world is a continuum in each and every one of its aspects." A recent position statement by the APA, the American Academy of Pediatrics and eight other national organizations agrees that "sexual orientation falls along a continuum." In other words, sexual attraction is simply not a black-and-white matter, and the labels "straight" and "gay" do not capture the complexities."

যৌনপ্রবৃত্তি যে কেবল সাদা- কালো এই দুই চরমসীমায় বিভক্ত নয় – মানব সমাজে এই চিন্তা- চেতনার ক্রমোত্তরণ ঘটানোর জন্য যে ব্যক্তিটির গবেষণা সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে তিনি হলেন জীববিজ্ঞানী আলফ্রেড কিন্সে। মুলতঃ কিন্সের গবেষণাই ষাটের

দশকে সূচিত করে যৌনতার বিপ্লবের (sexual revolution) এবং পরবর্তীতে উন্মোচন করে দেয় লেসবিয়ন, গে, বাইসেক্সুয়াল এবং ট্রান্সজেন্ডারদের মত সংখ্যালঘু মানুষের 'এলজিবিটি[19] আন্দোলনের' দুয়ার। তবে সেসমস্ত মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে ঢুকবার আগে আমাদের আধুনিক জীব বিজ্ঞান আর জেনেটিক্সের বইয়ের পাতায় একটু ভালমত চোখ রাখা দরকার। কারণ হরমোন, শরীরবৃত্তীয় এবং জিন সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষনা ধীরে ধীরে কাটাতে সাহায্য করেছে ধোঁয়াশার অস্বচ্ছ মেঘ। আগামী অধ্যায়গুলোতে আমি সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব। এ সংক্রান্ত আধুনিক গবেষণার ফলাফলে চোখ রাখলেই আমরা উপলব্ধি করতে পারব সমকামিতার কতটুকু জেনেটিক, আর কতটুকুই বা পরিবেশগত।

[19] LGBT (or GLBT) is an acronym referring collectively to lesbian, gay, bisexual, and transgender people.